OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 731 - 737
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘চোখের বালি’ ও ‘শেষের কবিতা’ : একুশ শতকের চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র উপন্যাসের নতুন-নির্মাণে অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির প্রসঙ্গ

নাজমা খাতুন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী
Email ID: rim8906@gmail.com
0009-0007-6656-596X

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Neo-Bhadralok, Women’s questions, Cultural materialism.

Abstract
At the beginning of the twenty-first century, as the neo-liberal economy expanded, scholars from various fields began to re-examine Tagore’s writings from a new perspective. In Bengali cinema, Rituparna Ghosh experimented with Tagore’s novel Chokher Bali to reassess questions of Bengali identity for the Neo-Bhadralok class, the new consumers of cultural products. Ghosh’s Chokher Bali opened a new vista for serious Bengali filmmakers to experiment with Tagore. Suman Mukhopadhyay made Sesher Kabita based on Tagore’s novel of the same name. In this paper, Chokher Bali and Sesher Kabita are discussed to examine identity and women's questions through the lens of cultural materialism.

Discussion

ভূমিকা : একুশ শতকে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের চলচ্চিত্রায়িত রূপ নির্মাণের নতুন একটি পরিসর তৈরি হয়েছিল মূলত ঋতুপর্ণ ঘোষের সৌজন্যে। সত্যজিৎ স্বাধীনতার পর সচেতন-নান্দনিকতায় নতুন সিনেমার ভাষায় রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প ও উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ নির্মাণের যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন একুশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ায় ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি যেন তারই সম্প্রসারণ। এ-রকম মনে হওয়ার একটা কারণ হয়তো এই যে ঋতুপর্ণ তাঁর ছবির কোনও কোনও দৃশ্যের ফ্রেম-নির্মাণের সময় সত্যজিতের ফ্রেম, ‘ট্রিবিউট’ দেওয়ার জন্যই, একরকম করে ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে একুশ শতকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার নতুন অভিমুখ গড়ে উঠেছিল বিশেষ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অশোক সেন, অভ্র ঘোষ, অনুপ ধর প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা-ধারায় রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে চাইছিলেন। ঋতুপর্ণের রবীন্দ্র-নির্মাণে এই ধারার প্রত্যক্ষ যোগ নেই আবার হয়তো আছেও। কারণ এই সময় রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে বুঝতে চাইছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ একুশ শতকে সচেতন ভাবেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নির্মিত ‘উনিশে এপ্রিল’ (১৯৯৪) ছবিতে তিনি রবীন্দ্র-জীবনের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন। তবে সেই অনুষঙ্গ ব্যবহার এক আর সরাসরি রবীন্দ্র উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ নির্মাণ আর এক। ঋতুপর্ণের ‘চোখের বালি’ (২০০৩) মুক্তির পর রবীন্দ্র-সময়কে ছবিতে পুনরায় নির্মাণের যে কাজ সত্যজিৎ করেছিলেন, তার সঙ্গে ঋতুপর্ণের কাজের তুলনা শুরু হয়। তাঁর ‘নৌকাডুবি’ মুক্তি পায় ২০১১ খ্রিস্টাব্দে। ঋতুপর্ণের পাশাপাশি সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘চতুরঙ্গ’ (২০০৮)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ও 'শেষের কবিতা' (২০১৫)-ও ছবিদুটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। 'শেষের কবিতা'-র চিত্রভাষায় সুমন ঋতুপর্ণের মতোই সত্যজিতের কাছে ঋণী, তা গোপনের চেষ্টাও তিনি করেননি। এই আলোচনা মূলত 'চোখের বালি' (২০০৩) ও 'শেষের কবিতা' (২০১৫) এই দুটি ছবির সঙ্গে আদি উপন্যাস রূপের তুলনামূলক আলোচনা অঙ্গসজ্জা ও গৃহ সংস্কৃতির সূত্রে আসবে। তারই অনুষঙ্গে আসতে পারে অন্যান্য ছবির কথা। এঁরা দুজনেই মূলত বিশ্বায়নের ফলে যে 'নিও ভদ্রলোক'[১] শ্রেণি তৈরি হয়েছে তাঁদের জন্যই রবীন্দ্র উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন ঘটিয়েছেন। 'কমার্শিয়াল' আর 'আর্ট' এই শব্দ দুটির সাহায্যে চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য ও রূপ নির্দেশের রীতি একুশশতকে আর প্রচলিত ছিল না। ঋতুপর্ণ ও সুমন দুজনেই মূল ধারার দর্শকদের জন্যই ছবি তৈরি করেছিলেন। তবে সেই মূলধারার দর্শক মূলত 'নিও ভদ্রলোক'। বিশ্বায়িত পৃথিবীর শহুরে নাগরিক তাঁরা। 'চোখের বালি'-তে বিনোদিনীর ভূমিকায় ঐশ্বর্য রাইকে ব্যবহার করার পিছনেও সিনেমার মূলধারায় বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রশ্ন-প্রসঙ্গটি যে ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ঋতুপর্ণের ছবিতে অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির প্রদর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ছবিতে, ক্রমশই সময় যত এগিয়েছে, বিশেষত শেষের দিকের ছবিতে, আউটডোরের পরিবর্তে ইনডোর বিশেষ ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। অন্তরমহলের টানাপড়েন আর নানা স্তরে যৌন-সংকট দেখানোর জন্য মৃদু-আলোয় গৃহাভ্যন্তরকে পরিসর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। মনের গহন আর ঘরের গহন দুই সম্পর্কিত। 'আরেকটি প্রেমের গল্প' (২০১১), 'মেমারিজ ইন মার্চ' (২০১১), 'চিত্রাঙ্গদা : দ্য ক্রাউনিং উইশ' (২০১২) এই ছবিগুলিতে নির্মাণ করেছিলেন গৃহাভ্যন্তর ও মনের অভ্যন্তর দুই প্রকাশের উপযুক্ত এক চিত্রভাষা। সে ভাষা অবশ্য দর্শক বিশেষের কাছে একমাত্রিক ও পুনরাবৃত্ত বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'চোখের বালি' অবশ্য নির্মিত হয়েছিল এই পর্বের আগে।

সদরের বদলে অন্দর ও অন্দরের সংস্কৃতি বিশেষ হয়ে উঠলে তার নির্মাণ কীভাবে ইতিহাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করা হচ্ছে তা আলাদা করে খেয়াল রাখতে হয়। সুমনের ছবিতে অবশ্য ঋতুপর্ণের অর্থে অন্দরের প্রয়োগ নেই, তবু তাঁর ছবিতেও অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির ভূমিকা বিশেষ হয়ে উঠেছে। এই অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির সূত্রে কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

১. একুশ শতকে বিশ্বায়নের ফলে যে 'নিও ভদ্রলোক' শ্রেণি গড়ে উঠেছিল তাদের মনের মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির চিরায়ত চেহারা সম্বন্ধে একটি ভাবনা ছিল। সেই ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথের লেখার বস্তুগত শিল্পরূপ হিসেবে নির্মিত চলচ্চিত্রে কীভাবে নানাচিহ্নের মধ্যে ধরা যায় সেই চেষ্টাই ঋতুপর্ণ ও সুমন করেছেন। অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির রূপ কীভাবে সাংস্কৃতিক পণ্যের দেশগত ও কালগত বিন্যাসে তাঁরা কাজে লাগাচ্ছেন তা আমাদের বিচার্য। এখানে মনে রাখা দরকার 'চোখের বালি' আর 'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উপন্যাসেই যে সামাজিক শ্রেণির জীবনকথা ধরা পড়েছে সেই শিক্ষিত ভদ্রবিত্তের সঙ্গে এখনকার 'নিও ভদ্রলোক' শ্রেণির সংযোগ-স্থাপন সহজ-সম্ভব।

২. মহিলাদের প্রসঙ্গটি আলাদা করে তাঁদের নির্মাণে কেন ও কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ তাও অঙ্গসজ্জা আর গৃহসংস্কৃতির সূত্রে আমরা বিচার করব। রবীন্দ্রনাথের এই দুই উপন্যাসেই অন্যরকম নারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী আর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের লাবণ্য। মনে রাখা দরকার লাবণ্য রবীন্দ্র-উপন্যাসে উপার্জনক্ষম নারী চরিত্র। গৃহ-শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরতা লাবণ্য এই উপন্যাসে অমিতকে প্রত্যাখ্যান করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে চরিত্রগুলির বিশেষ শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য বিচারে ও উনিশ-বিশ শতকে আধুনিকতার স্বরূপ অনুসন্ধানে অঙ্গসজ্জা আর গৃহসংস্কৃতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। একুশ শতকে বিশ্বায়নের মুখোমুখি হয়ে ঋতুপর্ণ ও সুমন যেন বাঙালির হারিয়ে যাওয়া অতীতকে নতুন করে পড়তে চাইছেন। নিও ভদ্রলোক শ্রেণি নানা কারণে এই সময় অসহায়। বঙ্গ-সংস্কৃতির চিহ্নগুলিকে যেন বৃহত্তর বিশ্বে, গ্লোবাল বিশ্বে, বেঁচে থাকার জন্যই পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। এর মধ্যে রবীন্দ্র-উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপের মধ্যে যদি দেখানো যায়, বাঙালি সংস্কৃতির সাবেকি চিহ্নগুলিকে খানিক প্রশ্ন করেও রবীন্দ্র-উপন্যাসে উনিশ-বিশ শতকে বাঙালি ভদ্রলোক পরিবারে অঙ্গসজ্জা আর গৃহসংস্কৃতির মধ্যে বেশ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহলে নিও ভদ্রলোকদের সংকট পরোক্ষে মোচন হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দুই উপন্যাসে ও তার চলচ্চিত্র রূপে অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির নির্বাচিত কিছু অনুষঙ্গ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঋতুপর্ণ ও সুমন : চলচ্চিত্রে অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির সাধারণ প্রসঙ্গ— সত্যজিৎ তাঁর *বিষয় চলচ্চিত্র* বইতে এক অর্থে সাধারণ বাঙালি দর্শককে চলচ্চিত্র উপভোগ করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করি।

> "বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিতে তোলা কিছু ছবি— যেমন কাশীনাথ, পল্লীসমাজ, গোরা, চোখের বালি — যেখানে উপন্যাসের প্রতি আনুগত্যই হলিউডকে বেশি কাছে আসতে দেয়নি। ...কিন্তু এই সব ছবির বাঙালীত্ব কেবলমাত্র বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ। এর চিত্রভাষায় এমন কোনো সজীব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই যাতে মনে হতে পারে এই ভাষার শিকড় রয়েছে বাঙলার মাটিতে। আসলে এর উৎস হল বাঙলার থিয়েটার।" (নিম্নরেখা সংযোজিত)[২]

কথাটি তাৎপর্যবাহী ও ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা রঙ্গমঞ্চে যখন নাটক হিসেবে অভিনীত হত তখন দর্শকদের মঞ্চে আকর্ষণ করার জন্য নানা উপায় ও প্রকরণের সাহায্য নির্দেশকরা গ্রহণ করতেন। তাতে চমক থাকত, কখনও কখনও চমক দেখাতে গিয়ে বাস্তবতা লঙ্ঘিত হত। সেই থিয়েটারের ভাষা দৃশ্য-সংস্কৃতির মাধ্যমগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রবল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রবীন্দ্র-সমকালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে খুব একটা আদৃত হয়নি। উনিশ ও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বিশশতকে বাংলা থিয়েটারের ভাষা ক্রমে বদলে গিয়েছিল। বিশেষ করে শম্ভু মিত্রের মেধাবী উদ্যোগে ও শিল্প-কুশলতায় রবীন্দ্র-নাটকের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রয়োগের যে রূপ তৈরি হয়েছিল তা বদলে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র তাঁর নাটকের, গীতি ও নৃত্য নাট্যের যে মঞ্চরূপ নির্মাণ করেছিলেন তার জন্য বিশেষ মঞ্চভাষা তাঁকে তৈরি করতে হয়েছিল তবে সে ভাষা সাধারণ রঙ্গালয়ের ভাষার থেকে আলাদা। তবে শম্ভু মিত্র নবনাট্যের জন্য রবীন্দ্র উপন্যাসকে যখন গ্রহণ করলেন তখন তা সত্যজিৎ কথিত 'বাঙলার থিয়েটার'-এর ভাষার থেকে অন্যরকম। শম্ভু মিত্র 'চার অধ্যায়' মঞ্চায়িত করেছিলেন। চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছিলেন, তবে শম্ভু মিত্রের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ভাষা সত্যজিতের অর্থে যথার্থ সিনেমার ভাষা নয়, তার মধ্যেও থিয়েটারের প্রভাব ছিল। সত্যজিৎ তাঁর 'নায়ক' ছবিতে থিয়েটারের ভাষা আর সিনেমার ভাষা দু'য়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা স্বাধীনতার পর আরেকটি শিল্প-মাধ্যমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটি সিনেমা। রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পমাধ্যম অর্থাৎ 'সিনেমা' বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এ-বিষয়ে সোমেশ্বর ভৌমিকের গবেষণার কথা সকলেই প্রায় অবগত।[৩] তবে সিনেমার নব্য ভাষা সম্পর্কে তিনি ও তাঁর সময়ের চলচ্চিত্র নির্মাতারা তখনও ছিলেন দীক্ষাহীন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প স্বাধীনতার পরেই বাংলা সিনেমার বিশেষ অবলম্বন হয়েছে এর অর্থ এই নয় রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে তাঁর লেখা থেকে চলচ্চিত্র হয়নি। নরেশ মিত্র পরিচালিত 'গোরা' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৮-এ। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। তবে স্বাধীনতার পর বাংলা সিনেমার জগৎ শিল্পগুণে বদলে গিয়েছিল। গোরা সিনেমার পোস্টারে পরিচালকের নাম নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা এই উপন্যাসই প্রধান। চলচ্চিত্র গৌণ। বই মুখ্য, ছবি গৌণ। তাই চিদানন্দ দাশগুপ্তের মতো সিনেমা-বোদ্ধাকে পরে বলতে হয়েছিল 'বই নয় ছবি'। সত্যজিৎ, ঋতুপর্ণ আর সুমন তিনজনের পোস্টারে ছবির অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ফর্ম হিসেবে আলাদা গুরুত্ব তাঁরা প্রতিষ্ঠা করছেন। রবীন্দ্র-রচনা তাঁদের অবলম্বন।

চিত্রভাষায় সজীবতা আনতে সত্যজিৎ কী করেছিলেন? খেয়াল করতে হবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে মূলত শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিবারকেই কেন্দ্রে রেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পঠন-পাঠন রত, স্কলারশিপ পাওয়া চাকরি-প্রত্যাশী পুরুষেরা যেমন পরিবারের মুখ্য তেমনই আছে জমিদার ও পড়তি জমিদার। মোটের উপর তাদের শ্রেণিগত ভাবে লিবারেল বুর্জোয়া বলা যায়। এই লিবারেল বুর্জোয়ারা তাদের পারিবারিক জীবনে অঙ্গসজ্জা ও গৃহ-সংস্কৃতির মাধ্যমে আধুনিকতার নবরূপ নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সঙ্গে তাঁদের বোঝাপড়ার ফলে পুরনো চিহ্নগুলির মধ্য থেকে অনেক কিছুই অপসারিত হল, নতুন চিহ্ন এলো। অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির এই রূপ উনিশ-বিশ শতকে ক্ষমতাশালী বাঙালির সাংস্কৃতিক রূপ, সেই লিবারেল বুর্জোয়াদের আনুকূল্যে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতিই আধুনিক বাঙালির সংস্কৃতি হিসেবে পরিগৃহীত। লোকায়ত বাঙালির জীবন একদিকে তার অঙ্গসজ্জা ও গৃহ-সংস্কৃতির রূপ একরকম।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তা দিয়ে চিরায়ত বাঙালি জীবনকে দেখানো হয়। আর ভদ্র ও উচ্চ, উচ্চমধ্য এবং মধ্য এই তিন-বিত্তের অধিকারী শিক্ষিত বাঙালির অঙ্গসজ্জা আর গৃহ-সংস্কৃতির মাধ্যমে দেখানো হয় আধুনিক বাঙালি জীবন। ছবিতে সজীবভাবে বাঙালি জীবনের শিকড়কে ধরতে চান বলেই সত্যজিৎ অঙ্গসজ্জা আর গৃহ-সংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটান তাঁর ছবিতে।

চিত্রভাষায় সজীবতা আনতে সত্যজিৎ অঙ্গসজ্জা ও গৃহ-সংস্কৃতির বস্তুরূপ চলচ্চিত্রের ভাষায় নির্মাণ করেছিলেন। 'চারুলতা' (১৯৬৪) ও 'ঘরে-বাইরে' (১৯৮৪) সত্যজিতের এই দুটি ছবির কথা মনে পড়বে। এই দুই ছবিতেই শ্রেণিগত ভাবে বিত্তশালী ভদ্রলোকের কথা প্রকাশ পেয়েছে। ভূপতি সম্পাদক। যদিও শেষ অবধি তার খবরের কাগজের ব্যবসার ভরাডুবি হয়, তবু পড়তি অবস্থা তার ভদ্রবিত্তের কথাকেই বেশি করে মনে করিয়েছে। তার বাড়ি, লাইব্রেরি, বৈঠকখানা, শয্যা, বাগান এ-সবের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ সেকালের বাঙালি জীবনকে একালে এনেছিলেন। আর ছিল অঙ্গসজ্জা। চারুর, মন্দার এমনকী অমলেরও। 'ঘরে-বাইরে' ছবিতে সত্যজিৎ অঙ্গসজ্জা আর গৃহ-সংস্কৃতিকে 'চারুলতা' মতোই আলাদা করে দর্শক-ভোগ্য করে তুলেছিলেন। নিখিলেশের রুচি আর বিত্ত, বিমলাকে গড়ে তোলার নিখিল-বাসনা আসবাবে অঙ্গসজ্জায় প্রকাশিত।

বাংলা থিয়েটার থেকে বাংলা সিনেমাকে মুক্তি দেওয়া ও বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্যকে সজীব ভাবে সিনেমার ভাষায় প্রকাশ করাই সত্যজিতের ছবির মূল বৈশিষ্ট্য বলা চলে। এ-জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও গল্পের চিত্ররূপ নির্মাণ করেছিলেন। একা সত্যজিৎ নন। সেই সময়ের আরও কয়েকজনের কথা আসবে যাঁরা রবীন্দ্র-কাহিনিকে চলচ্চিত্রের ভাষ্য দিচ্ছিলেন ছবির নতুন দীক্ষিত ভাষায়।

সত্যজিৎ রায় (ঘরে-বাইরে, নষ্টনীড়, তিনকন্যা) তপন সিংহ (কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ) পূর্ণেন্দু পত্রী (স্ত্রীর পত্র) এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে ছবি করার সময় রবীন্দ্র-রচনার সমকালকে চলচ্চিত্রের ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তবে সেই চাওয়া ঠিক নরেশ মিত্রের ছবির বাস্তবতা প্রকাশের মতো নয়। এঁরা পাশ্চাত্যের নিও রিয়েল চলচ্চিত্রের ধারার একরকম করে অনুবর্তী। তিনজনের সিনেমার ভাষাই অবশ্য আলাদা। তবে বাস্তবতার প্রশ্নে তাঁরা কখনও কাল্পনিকতাকে আশ্রয় দেননি, কল্পনা তাঁদের ছবির ভাষায় বাস্তবের অনুবর্তী হয়েছে। এই বাস্তবতার প্রকাশ বাইরের বা আউটডোরের ক্ষেত্রে একরকম, ঘরের বা ইন্‌ডোরের ক্ষেত্রে আরেক রকম। আমাদের আলোচনায় অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির প্রসঙ্গটি আসবে। সুতরাং রবীন্দ্র কথা-সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত অন্দরমহলই আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ করব। কারণ অন্দরেই অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির প্রসঙ্গটি যথার্থ পরিসর লাভ করেছে।

সত্যজিৎ 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে-বাইরে' ছবি করার সময় চারু ও বিমলা দুই রমণীর যাপিত অন্দরকে সময়ের যথার্থতায় নির্মাণ করেছিলেন। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্র'-ও তাই। এক অর্থে তাঁদের ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছিল রাবীন্দ্রিক অঙ্গসজ্জা আর গৃহসংস্কৃতির বিশেষ প্রদর্শন রীতি। একথাও মানতে হবে স্বাধীনতার পর সাধারণ দর্শক সত্যজিৎ ও পূর্ণেন্দু পত্রীর সূত্রে রাবীন্দ্রিক নায়িকার অঙ্গসজ্জা ও অন্দরমহল যখন দেখছেন তখন সেই দেখায় তাঁদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সাংস্কৃতিক বোধ একরকম করে তৃপ্ত হচ্ছে। সেই মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত দর্শক চৈতন্যকে তৃপ্ত করা চলচ্চিত্র পরিচালকদের উদ্দেশ্য। কারণ সত্যজিৎ ছবির অর্থনৈতিক সাফল্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি জানতেন রবীন্দ্র-রচনা থেকে অবলম্বিত ছবির উপভোক্তা মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক দর্শকেরা।

হলে গিয়ে সিনেমা দেখার যে জগৎ সত্যজিৎ-তপন-পূর্ণেন্দুরা পেয়েছিলেন এ-জগৎ তার থেকে আলাদা। ঋতুপর্ণ ও সুমনের বেছে নেওয়া দুই কাহিনিই এক অর্থে উচ্চমধ্যবিত্ত বা বলা ভালো ভদ্রলোক পরিবারের কাহিনি। ডাক্তারি পড়া, চাকরি করা, কিছু টাকা গ্রামের জমিদারি থেকে আসা এই অর্থনৈতিক কাঠামো ধরা পড়েছে। 'শেষের কবিতা'-য় এসেছে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজ তা 'চোখের বালি'-তে নেই। মুক্ত অর্থনীতির বিস্তারের ফলে ক্রয় ক্ষমতা সম্পন্ন গ্লোবাল অর্থনীতির অধিকারী হয়ে উঠলেন, বৈশ্বিক পুঁজির কর্মী হিসেবে যে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি, তাঁদের সিঙ্গল স্ক্রিনে ও ক্রমে মাল্টিপ্লেক্সে বাংলা সিনেমা দেখানোর জন্য টেনে আনা সিনেমা-শিল্পের জন্যই খুব জরুরি ছিল। তাঁদের বাঙালি আত্মপরিচয়কে নতুন ভাবে উস্‌কে তোলার জন্য উপভোগ্য এথনিক অন্দরসজ্জার প্রয়োজন হল। ঋতুপর্ণের ছবি ক্রমশই অন্দরমহল ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্তরমহলের ছবি হয়ে উঠবে। আউটডোর কমবে, ইনডোর দৃশ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আলোর কাজে অন্দরকে অস্পষ্ট মায়াময়তায় স্পষ্ট করে তুলতে চাইবেন। মেটিরিয়াল কালচারের সাক্ষ্যবাহী হয়ে উঠবে তাঁর অন্দরের দৃশ্যগুলি।

সত্যজিতের ফ্রেম ঋতুপর্ণ ও সুমন দুজনকেই প্রভাবিত করেছিল। সত্যজিতের ঘরে বাইরে ছবির শয্যাগৃহের বাহারি দীপদান ঋতুপর্ণ ও সুমনের ছবিতে ফিরে আসে। এ-কেবল সেকালের অন্দরের যথাযথ রূপ নির্মাণের জন্য একই সজ্জাদ্রব্যের ব্যবহার নয়, সেই খাটের চেহারা, দোলনা, বাগান, লুকিং গ্লাস সত্যজিতের 'চারুলতা' থেকে ঋতুপর্ণ আর সুমনের ছবিতে চলে এসেছে। শুধু কি তাই? সুমন তাঁর 'শেষের কবিতা'-য় যেভাবে বইয়ের সাহায্যে ঘর সাজান তা 'চারুলতা'-র কথা মনে করায়। চারুর থেকে লাবণ্য অবশ্য আরও শিক্ষিত। ইংরেজি-বাংলা উভয় বইয়ের পাঠিকা।

অভিজাত শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের ঘরে কী কী থাকবে? দেওয়ালে থাকবে বিশেষ ছবি। বইয়ের ঘরে থাকবে আলোকিত গাম্ভীর্য। টেবিলে বা অন্যত্র থাকবে ফুলদানি। এ-সবই নান্দনিক ও রাবীন্দ্রিক বলে চিনতে চাইবেন ও ছবির মাধ্যমে বাঙালির গৃহসজ্জার অঙ্গ বলে মেনে নেবে নতুন বাঙালি। তাদের গৃহ-পরিসরে এগুলি না-থাকলেও থাকা উচিত এই বোধ অন্তত মুহূর্তের জন্য সঞ্চারিত হবে। থাকলে পরিতৃপ্তি হয় এই বাসনা জেগে উঠবে।

ঋতুপর্ণের ছবিতে বিহারী ও মহেন্দ্র দুই বন্ধুর চরিত্র তাদের অঙ্গসজ্জার বিন্যাসে ধরা পরে। একই সাদা চাদর মহেন্দ্রর ক্ষেত্রে কামনা প্রকাশক, বিহারীর ক্ষেত্রে হাস্যময় সংযমের প্রকাশক। কখনও বা দৃঢ় সংযম। বিনোদিনী সালংকরা হয়ে বিহারীর বাড়িতে এসেছে। সেই গহনা পরিহিতা বিধবা-যুবতীর বিপ্রতীপে সাদা চাদর পরিহিতা বিহারী। বিনোদিনী যে সালংকরা হয়ে এসেছে তা ঢাকার জন্য একটি কালো চাদর দিয়ে নিজের অঙ্গ ঢেকে রেখেছিল। বিহারী বাড়িতে এসে সেই কালো চাদর সে খুলে ফেলে। রবীন্দ্র উপন্যাসে বিহারীর ঘর এতো বস্তু-সামগ্রী সমন্বিত নয়। ঋতুপর্ণের ছবিতে কিন্তু খাট-আয়না-দেওয়ালের ছবি সবমিলিয়ে বাঙালি ভদ্রলোক ব্যাচেলরের ঘর বিশেষ হয়ে ওঠে। যেন বিহারীর দীর্ঘ সাদা ছায়া পড়বে আয়নায়, আর আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে খাটে বসে কাঁদবে বিনোদিনী এই দৃশ্য নির্মাণের জন্যই এই আসবাব দিয়ে ঘরটি সজ্জিত। এই কৃত্রিমতা সত্যজিতে প্রকট নয়, ঋতুপর্ণের ছবিতে প্রকট। ধীরগতি ক্যামেরা গৃহসজ্জার দ্যোতনাকে প্রকাশ করতে বদ্ধ পরিকর। এক রকম সমৃদ্ধ বাঙালিয়ানার রুচিশীল চিহ্নবাহী বিহারীর ঘরটি যত না রবীন্দ্রনাথের তার থেকে অনেক বেশি নিও ভদ্রলোকদের জন্য ঋতুপর্ণ পরিকল্পিত।

সুমনের ছবি 'শেষের কবিতা'-য় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ এসেছে অমিতর বন্ধুবর্গের সূত্রে। এসেছে তাদের বিদেশের জীবনের ছবি, স্বদেশের মধ্যেও তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার সাজ-সজ্জা ও সংস্কৃতি। এরই বিপরীতে অমিতর লড়াই। রবীন্দ্রনাথ তার সজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, -

> "দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি।"[৪]

সুমন তাঁর ছবিতে অমিতর এই সজ্জাটি নানা ভাবে ব্যবহার করেন, অমিতর মধ্যে দুই অমিত আছে। যে অমিত কেতকীর সেই অমিতর সঙ্গে লাবণ্যের অমিত হতে চাওয়া অমিতর যে পার্থক্য তা বোঝানোর জন্যই অমিতকে দু'রকম সজ্জায় তুলে ধরা হয়। কেবল বাঙালিয়ানার প্রতিষ্ঠা নয়, আধুনিক বাঙালিয়ানার দ্বন্দ্বও এর মধ্যে রয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মেয়েদের কথা : রবীন্দ্রনাথের এই দুটি উপন্যাসে মেয়েদের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই ঋতুপর্ণ ও সুমন দুজনেই অঙ্গসজ্জা ও গৃহসংস্কৃতির সূত্রে মেয়েদের কথা এনেছে। সময়ের দিক থেকে 'চোখের বালি' আগে, 'শেষের কবিতা' পরে। 'চোখের বালি'-তে যেভাবে বিধবার কথা এসেছে সেভাবে 'শেষের কবিতা'-য় বিধবার কথা আসেনি। 'চোখের বালি'-তে বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীকে চা-খাওয়ানোর রীতিতে অভ্যস্ত করে তোলে ও চা-পানকে যেভাবে মেয়েদের পক্ষে বিপ্লবের স্বর হিসেবে দেখান তা সুমন করেননি। সেখানেও চা-পানের দৃশ্য আছে। যোগমায়া আর লাবণ্য পরস্পর কথা বলছে। যোগমায়া স্বামীহারা, তাঁর বৈধব্য রাজলক্ষ্মী কিম্বা অন্নপূর্ণার মতো নয়। লাবণ্য বারান্দাওয়ালা কাঠের বাড়িতে যোগমায়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চা খায়। সেই চা যোগমায়াই নিজহাতে লাবণ্যকে টিপট থেকে ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর হাতে বই, বই পড়ছেন। নারীদের, দেশজ নারীদের এই মুক্ত-জীবনের চিহ্ন হয়ে উঠছে চা-খাওয়া, বই পড়া। লাবণ্য যে কথা বানিয়ে তোলা অমিতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারল তার জন্য যোগমায়ার গৃহসংস্কৃতির দান অপরিসীম।

বিনোদিনী ছাড়া 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিধবারা এমন কী সধবা আশালতাও বেশ অসহায় এক অর্থে। আশালতা রবীন্দ্র উপন্যাসে যেমন ঋতুপর্ণের ছবিতেও তেমন অসহায়, যৌন-নন্দনবোধের অনধিকারী, গৃহের বিন্যাসে অন্দরসজ্জায় অপটু। এখান দিয়েই সর্বাত্মক ভাবে বিনোদিনীর প্রবেশ। আমরা এখানে তাই কীভাবে বিনোদিনী আশালতাকে ব্যবহার করে নিজের বাসনাকে উপভোগ করে তার ছবি রেখেছি। গহনা দিয়ে খোঁপা বেঁধে দেয়। আতরের ব্যবহার করতে শেখায়। শেমিজ পরতে শেখায়, শাড়ির ভেতরে। আর নিজেকে বিনোদিনী গহনায় সাজিয়ে বিহারীর কাছে নিজেকে উন্মুখ ভাবে প্রকাশ করে। সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির বিধবা কাবেরী বসুর গহনা পরিহিত বাসনা দৃশ্য মনে পড়বে। ঋতুপর্ণ তাঁর ছবিকে প্যাশন প্লে বলেছেন। বাড়ির আসবাব, পরিসর সেই প্যাশন প্রকাশের উপায়। ছবিতে আমরা আশালতার বন্ধ শোবার ঘরে দুই মুখোমুখি নারীকে দেখছি। এখানে ছবিতে সিঁড়িটি বার-বার আসে। প্যাশনের ওঠা-পড়া, দাঁড়াবার জায়গা, কখনও উপর থেকে নিচে দেখবার গ্যালারি। এসেছে ছাদ ও বারান্দা। বাহুল্যবোধে বিনোদিনীর ঋতুস্রাবের দৃশ্য দেখানো হল। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত যুক্তিতে লিখেছিলেন স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী শরীর পাষাণবৎ হয়ে যায় না।

নানাভাবে মেয়েদের গৃহসংস্কৃতিকে ঋতুপর্ণ এনেছেন। কুটনো কাটা, আলতা পরা, গহনার বাক্স দেখা, পুজোর উপকরণ সজ্জা ইত্যাদি। আমরা ইচ্ছে করেই অন্যরকম তিনটে সাংস্কৃতিক পর্যায়কে রেখেছি। বিধবার চা-পান, যা সামাজিক অবদমনকে প্রশ্ন করেছে।[৫] দ্বিতীয় ছবিটি বিনোদিনীর গ্রামের বাড়ির ছবি। সেকালে সকলের গ্রামের বাড়ি এমন হত না। বিনোদিনীর ঘর এমন। কারণ বিনোদিনী তো মেমসাহেবের কাছে পড়া, চকলেট খাওয়া চিঠি পড়তে পারা মেয়ে। তাই কলকাতায় সে মহেন্দ্র-আশার বাড়িতে এভাবে দেওয়ালের নগ্নিকা মূর্তির সামনে তীব্র আবেগ নিয়ে দাঁড়ালে মানিয়ে যায়। বঙ্কিমের কৃষকান্তের উইল উপন্যাসের নগ্নিকা ভাস্কর্য, যা গোবিন্দলালের বাগানে ছিল তা মনে পড়ে।

সুমনের শেষের কবিতার গৃহসজ্জায় বই খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা কেবল সজ্জার অঙ্গ নয়, মেয়েদের মুক্তির চিহ্ন। লাবণ্য ও যোগমায়া দুজনেই বই পড়েন। চারুলতার চাইতেও তাঁরা বিদুষী, ইংরেজি পড়তে সমর্থ। শেষের কবিতার নির্মাণে তাই বাড়ির লাইব্রেরি ঘরকে সুমন বারবার দেখান, নানা অনুষঙ্গে। এই অনুষঙ্গ মেয়েদের সাপেক্ষে আরেক রকম হয়ে ওঠে। যোগমায়া স্বামীর জীবৎকালেই নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করেছিলেন। চা ঋতুপর্ণের ছবিতে বন্ধ দরজার মধ্যে পান করছিলেন মেয়েরা। ১৯২-১৯৩০ সুমনের ছবির সময়, মেয়েদের চা-পান তখন স্বাভাবিক, লুকোছাপা নেই।

ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের কথা এসেছে। কেতকীকে সেভাবেই দেখিয়েছেন সুমন। মা যা হইয়াছেন এ-কথা তার সম্বন্ধে অমিত ভাবে। বঙ্কিমের আনন্দমঠ উপন্যাসের এমন প্রয়োগ, ব্যবহার রবীন্দ্র উপন্যাসে ছিল না। সুমনের ছবিতে ছিল। কেতকী শেষ অবধি রং হারা। অমিত বাইরের রঙ মাখতে নিষেধ করেছে। মা যা হয়েছে থেকে মা যা হল। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ভাবনাই কেতকীর এই অমিতের চাওয়ার মধ্যে জিতে গেল। ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের সিগারেট খাওয়া ও অন্যান্য ফ্যাশনের পরাজয়, রাবীন্দ্রিক স্টাইলের জয়। সুমন ছবিতে অঙ্গসজ্জার দৃশ্যান্তরের মাধ্যমে তাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 82
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 731 - 737
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপসংহার : ঋতুপর্ণ ও সুমন যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভাবে অবলম্বন করে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইছিলেন সময় এখন তার থেকেও এগিয়েছে। বাঙালির আত্ম-সংস্কৃতির সংকট মোচনে রবীন্দ্র উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তাই এই চলচ্চিত্র সংস্কৃতি এখন খানিক অস্তমিত। ঋতুপর্ণ ও সুমন যে নিও ভদ্রলোকদের জন্য ছবি করেন তাঁদের কাছে রবীন্দ্র-পরবর্তী অন্যান্য সাহিত্যিকদের উপস্থিত করা যায় কি না সে ভাবনা থেকেই হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী ডাক্তারের প্রতি সুমনের আগ্রহ। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' যে গাওদিয়া গ্রামকে নিয়ে লেখা সেই গ্রামের ইতিকথা সুমন দেখাতে গিয়ে শশী ডাক্তারের ঘরটিকে একটি দৃশ্যে আলাদা করে দেখান। ঋতুপর্ণের ছবির ব্যাচেলর ডাক্তারি পড়া বিহারীর ঘরের মতো নয়, টেবিল-আনলা-খাট-আয়না-খড়খড়িওয়ালা জানলা-দেওয়ালে ডাক্তারির সার্টিফিকেট-বালি ঘড়ি সবমিলিয়ে এই ঘরখানি যেন কলকাতা বহির্ভূত গ্রামে বাঙালি ভদ্রলোকদের অস্তিত্বের সংকটের বার্তা বহন করছে। কুসুম বিনোদিনী নয় তবে এই ঘরের দাহ দর্শক টের পান। তা সজীব হয়ে ওঠে শশীর বিড়ি-ধরানোয়, কুসুমের ইঙ্গিতবাহী প্রশ্নে ও শশীর খাটে বসায়, শশীকে স্পর্শ করায়। সিনেমার ভাষায় এই অঙ্গসজ্জা আর গৃহ সংস্কৃতি নানাভাবে ফিরে ফিরে এসে বাঙালি জীবনের শিকড়কে সজীব করে তোলে।

Reference:

১. মৈনাক বিশ্বাস, নিও-ভদ্রলোক দর্পণ, বারোমাস, ৩১ : ১, সেপ্টেম্বর ২০১১
২. সত্যজিৎ রায়, "অতীতের বাংলা ছবি", *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯
৩. সোমেশ্বর ভৌমিক, *রূপের কল্পনির্ঝর/ সিনেমা আধুনিকতা রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১১
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেষের কবিতা, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৮, পৃ. ১১০৬
৫. Gautam Bhadra, *From an Imperial Product to a National Drink*, Kolkata, CSSSC, 2005